জেগে আছি, বীজে বৃক্ষে ফুলে

পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রতিভাস/১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলিকাতা-২

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৬০

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রতিভাসের পক্ষে সন্ধ্যা সাহা কর্তৃক ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড
কলকাতা-৭০০০০২ থেকে প্রকাশিত এবং ইডেন প্রিন্টিং
এর পক্ষে নিতাই সামন্ত কর্তৃক ২৬ সি. সাহিত্য
পরিষদ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬
থেকে মুদ্রিত।

মৃদুল দাশগুপ্তকে

কথোপকথন আর কথোপকথন ২ এর মাঝখানে আর কোন কবিতার বই বেরোয়নি আমার। এ দুটো বই সিরিজের মতো। ফলে টুকরো কবিতা জমে উঠছিল ক্রমাগতই। তার থেকে দু তিন মুঠো নিয়ে এই নতুন বই। গদ্য লেখা কবিতা নিয়ে বই বেরোলে মনের মধ্যে একধরনের উৎকণ্ঠ আগ্রহ থাকে। এ বইটার বেলায় তেমন কিছু অনুভব করছিনা এই কারনে যে, এর মধ্যে তিনচার বছর আগের লেখাও রয়ে গেছে অনেক। তাদের উপর দিয়ে এতখানি দীর্ঘ সময়ের হাওয়া বয়ে গেছে বলেই, অনেকখানি উদাসীন হতে পেরেছি আমি। বরং সম্পূর্ণ ছাপা হয়ে বইটা যখন হাতে আসবে, হয়তো চমকাবো খানিকটা। তাই নাকি, এসব লিখেছিলুম এক সময় ? এই প্রথম আমার কবিতা আমাকে দেবে এক আশ্চর্য উপঢৌকন।

পূর্ণেন্দু পত্রী।

ডাকাডাকি কেন ?

এত ডাকাডাকি কেন ?
আমি তো রয়েছি জেগে সর্বসমক্ষেই ।
ঐ তো আমার ছেঁড়া চটি জুতো পড়ে আছে
উদ্দাম সোপানে ।
আমার তুলির দাগ তোমাদের কাগজে মলাটে
আমার রক্তের দাগও খুঁজে পাবে ধুলোয়-আগুনে ।
জেগে আছি শ্মশানে, ত্রিশূলে
জেগে আছি বীজে, বৃক্ষে, ফুলে ।
তবু এত ডাকাডাকি কেন ?
তোমাদের ঝলমলে শিকড়বিহীন মত্ত উল্লাসের চেয়ে
আমার নিভৃত এই অন্ধকার
ভাঙা সিঁড়ি
গোপন প্রদীপ
ঢের বেশী প্রেয়সীর মতো ।

সে আছে সৃজন সুখে

সে আছে সৃজন-সুখে
নিজস্ব কর্ষণে
তাকে অত ভীড়ে, অত লোকালয়ে, খররৌদ্রপাতে
তোমাদের দু-বেলার সংঘাতে ও সঙ্ঘের চত্বরে
সহসা ডেকো না।
যেহেতু সে তোমাদেরই একান্ত আপন
শুভাকাঙ্ক্ষী, সমর্থনকারী
তোমাদেরই রক্তচিহ্ন
রেখেছে সে কপালের ত্রিশূল-রেখায়।

সে আছে সৃজন-সুখে
সুখ মানে উলুধ্বনি নয়।
সে নিমগ্ন হয়ে আছে
সময়ের বিনষ্ট ফাটলে।
পরিপক্ব দ্রাক্ষা নয়
তার প্রিয় অন্বেষণ দ্রাক্ষার গভীর অগ্নিমূল।

একটি মৃত্যুর শোকে

একটি মৃত্যুর শোকে
আজকের ভোরবেলা ভরে গেল স্মরণীয়তায়।
অনেক দিনের পরে
রৌদ্রকেও মনে হল শিল্পসচেতন।

ঝাউবনে হাওয়ার বিলাপ :
শুনেছো তো,
মানুষটি জ্বরে পুড়ে ঘুমোতে গিয়েছে ?
এতদিন আমাদের নাড়ী ও নক্ষত্রে মিলেমিশে
এতদিন আমাদের পরবাস-যাপনের অলৌকিক পুরাণ শুনিয়ে
এতদিন প্রিয়মুখস্মৃতিগুলি সরু টানে এঁকে
দেবতার দুহিতাকে আমাদের রোজকার বৌ-ঝির সিঁথীতে সাজিয়ে
বর্ণকে মন্ত্রের ন্যায় নিনাদিত করে
ঘুমোতে যাওয়ার মতো
মানুষটি চলে গেল আরও বড় স্বপ্নের ভিতরে।

মৃত্যুর বর্ণাঢ্য শোকে
আজকের ভোরবেলা ভরে গেল শিল্পমহিমায়।

নন্দীনির ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে

দিনের বারো আনাই আস্তাবলে
বাকি চার আনায় এই সব সতেরো রকম ওড়াউড়ি।

এক একদিন এই চার আনারও বারো আনা চলে যায়
নন্দিনীর ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে।

নন্দিনীর সঙ্গে বারো বছর দেখা হয়নি আমার।
শুকনো হাতে সেই কবে চার আনার সুখ তুলে দিয়ে

ব্যস্ত চড়ুইয়ের মতো
সাত সাগর ডিঙিয়ে উধাও।
সেই চার আনা সুখ
এক আনা কবিতায়
এক আনা ছবিতে
এইভাবে খোয়াতে খোয়াতে এখন শেষ কৌটায়।

আর এও এক আশ্চর্য
ঠিক নন্দিনীর ঠিকানা খুঁজতে বেরোবার মুহূর্তেই
যত রাজ্যের টেলিফোন, ট্রাঙ্ককল
ইনক'ম ট্যাক্সের নোটীশ,
সাড়ে সতেরো পার্সেন্টের হিসেবে ব্যাঙ্কের ইণ্টারেস্ট

প্রুফের তাড়া নিয়ে প্রেস
লেখার তাগাদা নিয়ে সম্পাদক
নাড়ি টেপার জন্যে ডাক্তার।

ক্ষণেক দাঁড়াও মেঘ, রাজহংসী অমল ডানার
ক্ষণেক দাঁড়াও ঋতু, হে বসন্ত, হে হিম অঘ্রান
অরণ্য-পাহারা ঠেলে কাছে এসো নীল-নির্ঝরিণী
ক্ষণেক দাড়াও ঘাটে হে অনন্ত সময়-প্লাবন।

ক্ষণেক দাঁড়াও ঘাটে হে অনন্ত সময় প্লাবন।
বারো আনা খরচ হয়ে-যাওয়া জীবনে
আরও একবার পেয়ে যেতাম যদি নন্দিনীর ঠিকানা
আরও একবার চাদ আনার মতো সুখ পেলে
হয়তো সম্পূর্ণ হতো আমার বিস্ফোরণ।

আমারই তো অক্ষমতা

আমারই তো অক্ষমতা।
তোমার গোলাপ জানি সারারাত খুলে রেখেছিল
সাদা অন্ধকারে লাল বাঁকা সিঁড়ি, দিকনির্ণয়ের
সবুজ কম্পাস।
আঙুরবীথির পথ পরীর ডানার মতো উড়ে গেছে
সঙ্গীতের দিকে।
আমার দীক্ষার কথা ছিল ঐখানে।
পায়ে পায়ে এত সব শিকড়-বাকড়
নাট-বল্টু, জট্, গুল্মটান
পৌঁছতে পারিনি।
পরাধীনতার চেয়ে ঢের বেশী বেদনার ভার হয়ে উঠেছে এখন
নানাবিধ স্বাধীন শিকল।
অক্ষরের থেকে আলো
বীজের ভিতর থেকে প্রাণকোষ ছিঁড়ে-নিংড়ে নিয়ে
খোসার উৎসব বেশ জমজমাট বাজারে-বন্দরে।
সমুদ্র আড়াল করে সার্কাসের তাঁবু।
অর্ফিউসের বাঁশি
দিক্‌পাল ক্লাউনেরা পা দিয়ে বাজায়।

আমারই তো অক্ষমতা।
সৌররশ্মি দু'হাতে পেয়েও
গড়িনি কুঠার।

ও সিঁদুরে মেঘ

যেহেতু স্বভাবে আগুনের ঘরবাড়ি
ঘর-পোড়া গরু হয়েছি বারংবার
অথচ যখনই যে-আকাশে দেখি সিঁদুরে মেঘের শাড়ি
পাখোয়াজে ঝঙ্কার।

সময়ের কাছে নতজানু নিয়তই
আমি বা আমার ব্যগ্র কলস্বর,
নিজের গোপন হিংস্র আবেগে তথাচ প্রায়শ হই
স্বরচিত ঈশ্বর।

পুরোহিত যেন প্রস্তুত প্রতি খণ
ফাটা কপালের সংবাদ আছে জানা
খসবে জেনেই নিংড়ে চলেছে কাঠ থেকে চন্দন
স্বপ্নের জরিমানা।

হল্ট! শুনলেই যদি থেমে যেতো চলা
খুবই খুশী হতো সময়ের দারোয়ান
কিন্তু মাতাল বাজিয়ে যাবেই উল্কা-চিবোনো গলা:
আরো আন্ আরো আন্।

অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে
কেউ কেউ পারে খুবই দ্রুত নিতে যেতে
একটি রমণী একটি চেয়ার এবং একটি মাছে
পরিতৃপ্তি পেতে।

কিন্তু মূলতঃ সেইই পায় শেষ মালা

যার চুল্লীতে কখনো নেভেনা কাঠ
যে কেবলই খোঁজে প্রশ্নের ঝড় প্রশ্নের নদীনালা
প্রশ্নে অগ্নিছাট।
অনেকে জানে না কিংবা গিয়েছে ভুলে
কি রকম খেলা সময়ের অতি প্রিয়
নিজেই মৃত্যু হেনেছিল যাকে, শবাধার থেকে তুলে
পরায় উত্তরীয়।

ও সিঁদুরে মেঘ, সিঁদুরে মেঘের শাড়ি
তোমাকেই খুঁজে চলেছি বারংবার
নানা ছারখার ডিঙিয়ে আমার উৎক্রমণের পাড়ি
আগুনচ অহঙ্কার।

হে স্তন্যদায়িনী

তোমার দুধের মধ্যে এত জল কেন ?
তোমার দুধের মধ্যে এত ঘন বিশৃঙ্খলা কেন ?

রক্ত ঝড়ে না ভেজালে
কোনো সুখ দরজা খোলে না।
ময়ূরও নাচে না তাকে দু-নম্বরী সেলামী না দিলে
হাতুড়ীর ঘায়ে না ফাটালে
রাজার ভাঁড়ার থেকে এক মুঠো খুদ খেতে
পায়না চড়ুই।
স্বপ্নে যারা পেয়ে গেছে সচেতন ফাউন্টেনপেন
তাদেরও কলমে দেখ
সূর্যকিরণের মতো কোনো কালি নেই।

হে স্তন্যদায়িনী
তোমার দুধের মধ্যে এত জল কেন ?
তোমার দুধের মধ্যে
প্রতিশ্রুত ভাস্কর্যের পাথর কেবল।

কাঠের পায়ে সোনার নূপুর

পা গুলো কাঠের
আর নূপুরগুলো সোনার
এইভাবেই সাজানো মঞ্চে নাচতে এসেছি আমরা।
একটু আগে ছুটে গেল যে হলুদ বনহরিণী
ওর পায়ের চেটোয় সাড়ে তিনশো কাঁটা।
সারাটা বিকেল ও শুয়েছিল রক্তপাতের ভিতরে
সারাটা বিকেল ওকে ক্ষতবিক্ষত করেছে
স্মৃতির লম্বা লম্বা পেরেক।
অথচ নাচের ঘণ্টা বাজতেই
এক দৌড়ে আগুনের ঠিক মাঝখানে।

বাইরে যখন জলজ্যান্ত দিন
সিঁড়ির বাঁকে বাঁকে তখন কালশিটে অন্ধকার।
যে-সব জানলার উপরে আমাদের গভীর বিশ্বাস
তাদের গা ছুঁয়েই যতো রাজ্যের ঝড়-বৃষ্টির মেঘ।
অথচ এইসব ভয়-ভাবনার ভিতরেই আমাদের মহড়া
আমাদের ক্লারিওনেট
আমাদের কাঠের পায়ে সোনার নূপুর
আমাদের ভোল্ট-কেয়ার নাচ।

ওলোট পালোট হাওয়া

ওলোট-পালোট হাওয়া
হাওয়ার সঙ্গে এলোপাতাড়ি বৃষ্টি
বৃষ্টির সঙ্গে চালসে-চোখের মেঘ
মেঘের সঙ্গে সাঁতসেঁতে মাটির শ্বাসকষ্ট।
হাওয়া ওলোট-পালোট হলেই
ভুস গাছের উপর হামলা
ফুটবার আগেই কুঁড়ির গলায় ছুরি
আর শিকড়
যা গাছকে বাড়তে বলে
নিজে নেমে যায় প্রতিবন্ধকতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে
নিশ্বাসের বিশ্বাসের তত্ত্বতরকারীর খোঁজে
সেই শিকড়ের ঘাড়ে
ভাগাভাগির কুড়োল।
ওলোট-পালোট হাওয়ায়
সিংহাসন এখন টলমল
তার লজগজে ফুটো থেকে ছিটকে বেরিয়ে
স্ক্রু-পেরেক নাট-বল্টুরাও
এখন লাফিয়ে উঠবে
সিংহাসনের সোনালী পশম
আর রুপোলী হাতলের দিকে।
আর এই রকম তছনছ্ হৈ-হাঙ্গামার সময়
সিংহাসনের স্থায়ী স্বত্ব রাখতে গেলে
হাতের খড়্গটাকে না ঘুরিয়ে উপায় নেই।

সুতরাং আমরা চাই বা না চাই
এখন কেবলই দেখে যেতে হবে
রক্তের ফিন্‌কি
ঘাসের উপরে আছড়ে-পড়া রক্তিম আর্তনাদ
নিহত দিনের পেটে
মানুষের শোকমিছিল
আর আক্রান্ত রাত্রির ভিতরে
মানুষের কঠিন চোয়ালের
নীরব সব উচ্চারণ।
আমরা চাই বা না চাই,
হাওয়া যখন ওলোট-পালোট,
অনেক উল্কা খসবেই
জমকালো ডাইনিং টেবিলের ডিশে,
অনেক লম্বা দালান
নিজেকে ঘিরে ফেলবে নিরাপদ প্রাচীরে,
সময়ের খরস্রোত থেকে
ভিন্ন বন্দরে পালাতে চাইবে অনেক নৌকো।
গা থেকে আগুনের পালক খুলতে খুলতে
অনেকেই বোঝাতে চাইবে
ছিলাম ভুল পতাকার গোলাম।
যতক্ষণ না আকাশ ফাটিয়ে
বড়ো মাপের ঝড়,
ওলোট-পালোট হাওয়ায়
এইভাবেই উড়ে পুড়ে ছিন্নভিন্ন হবে
সন্ধিক্ষণ।

সরোদ আমাকে ছিঁড়ে

সরোদ গভীরে বাজে
ছেনি কাটে আদিম পাথর।

তোমাদের পিকনিকের নিমন্ত্রণ
পেয়েছি বিকেলে।

তোমাদের হাসপাতাল
ভরে গেছে অসুখের বাদামী হল্লোড়ে
জেনেছি সন্ধ্যায়।

তোমরা নিজস্ব মঞ্চে
এমনকি শিক্ষাহীন নাচের জন্যেও
দশহাজার পুরস্কার ঘোষণা করেছো
শুনেছি রাত্তিরে।

আমার এখান থেকে ওঠা অসম্ভব
যতক্ষণ রেকর্ডপ্লেয়ারে
সরোদ আমাকে ছিঁড়ে ভাস্কর্যে সাজাবে।

শৃঙ্খলা ভেঙেছি আমি

শৃঙ্খলা ভেঙেছি আমি, অকপট, অস্বীকার নেই।
পোর্সেলিন মসৃনতা, বাসনের বিশুদ্ধ গড়ন
তছ্‌নছ্‌ হয়ে গেছে, শেয়ালদার ষ্টেশানে যা হয়
বিক্ষুব্ধ যাত্রীর হাতে, সেইভাবে ভেঙেছি অনেক
রীতি-নীতি-শিষ্টাচার। কেউ সুখী হয়নি কখনো
আমার নির্মাণে, তবু নিজেরই গরজে স্বরচিত
দুর্গ-ভাঙি, এলেবেলে চিঠি এলে যে-ভাবে ছিঁড়েছি
সেইভাবে বাতাসের উল্টোদিকে ছুটে যেতে চাই।
যেভাবে নিজের বুকে আঁকড়ে ধরে আছে বিষ্ণুপুর
টেরাকোটা, আসলে যা মাটির শিল্পিত অহঙ্কার
আগুনে পোড়ানো, আমি তার বেশি চাইনি কিছুই।

আমি তো বলিনি, সুখ! এসো থাটে পাশাপাশি শুই

অষ্টাদশ শতকের মতো ঘুম

কার ডাকে জেগে উঠে
মেঘের গলায় গাঢ় মালকোষ শুনে
আবার ঘুমিয়ে গেছে এই নদীজল।

অথচ নদীর পাড়ে অবিরল চড়ুইভাতির
পেয়ালার পিরীচের ফ্রাই-প্যান কাঁটা-চামচের
মাছের মাংসের স্যালাডের
মাছ ও মাংসের মতো উত্তেজক জার্নালের ভিডিও টেপের
জিনস্ মিডি হাইহিল মাস্কারার স্নো-স্নীটারের
হাই-ফাই জমাট সিম্ফনী।
দেশে দেশে দিকপাল ক্ষমতালোভীর মতো প্রতিযোগিতায়
দাঁতালো কামড় ছুঁড়ে সারা বেলা পরস্পর যুদ্ধে নাজেহাল
হাড়গিলে কুকুরের ঝাঁক।
থাক বা না-থাক
চিকেনের মিহি হাড়ে পেয়ে গেছে অবিকল পাটলিপুত্রের
সোনার যুগের স্বাদ্ ঘ্রাণ।
তাজা বিরিয়ানী থেকে যেন কিছু জাফরান খুঁটে নেবে বলে
গাছের নরম ডালে নেমে আসে কাঙাল দুপুর।
আহ্নিক গতিতে সূর্য বাঁকে।
সূর্য যত বাঁকে তত মানুষের ছায়া দীর্ঘ হয়
কোনো কোনো মানুষের ছায়া ফুলে-ফেঁপে ক্রমে পাহাড়-পর্বত
কোনো কোনো মানুষের ছায়া বহু গোল চৌকো নক্‌শার উল্লাসে
বাপদাদের উড়ন্ত কার্পেট।

কার ডাকে জেগে উঠে
মেঘের গলায় গাঢ় মালকোষ শুনে
অষ্টাদশ শতকের মতো ঘুমে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়েছে
এই নদীজল।

শ্বাসকষ্টের অভিজ্ঞতা

স্থাবর-অস্থাবর

দেয়াল, দরজা আলমারী চুরমার ভেঙে পড়ছে
শ্বাসকষ্ট যখন এই রকম,
বিছানা ছেড়ে বিছানার উপরে
হরাইজেণ্টাল থেকে ভার্টিক্যাল
তাও সরলরেখাকে ভেঙে, দুমড়ে, নুইয়ে
যতখানি নীচু হলে একটা শুকনো ঠোঁট
আরেক পুষ্পিত ঠোঁট থেকে শুষে নিতে পারে
জ্বলে-ওঠার স্ফুলিঙ্গ,
সেইভাবে ঝুঁকে,
বালিশের উপর বালিশ
বুক সমান তুলোর দেয়াল
বালিশগুলোকেই খামচে, জাপটে, নিংড়ে, জড়িয়ে,
যেন বালিশগুলোই জীবনধারণের সব
অর্থাৎ যা কিছুকে অাঁকড়ে ধরার নাম জীবন,
সেইই যেন ঘনিষ্ঠ নারীর সেবা-শুশ্রূষা
আবার প্রশ্নচিহ্নও
যার জটিল পাকগুলোকে খোলাখুলির মধ্যেই
বেঁচে-থাকার উর্মি-মুখরতা।

উর্বরতা বলতে কি বুঝি আমরা ?
বুঝি বৃক্ষলতার স্বাধীন এবং
স্বাস্থ্যবান নৃত্যগীত।

উন্মোচন বলতে কি বুঝি আমরা ?
যা কিছু তীব্র পিপাসা হয়ে জমে আছে
কণ্ঠনালীতে,
সেই সব ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা।
স্বপ্ন-সাধের
বাধাবন্ধহীন বিকাশ।
অথচ আমার চারপাশে নিঃসাড় পৃথিবী
আর স্তব্ধতা এমন মর্মান্তিক
লেবাননের ক্ষীণতম কান্নাকেও মনে হয় কত কাছে
যেন এইখানে, বুকে,
ক্রমাগত উপড়ে যেতে চাইছে যার শিকড়।
অথচ উৎপীড়ন যতই পেরিয়ে যাক
সহনশীলতার শেষ দাগ,
আমি তো চেতনাকে বলতে পারি না
নিপাত যাও।
তাই জেগে,
সমস্ত আভ্যন্তরীন সন্ত্রাস সত্ত্বেও
জেগে থাকি,
আর জেগে জেগে ওদের দুজনকেই দেখি কেবল
পৃথিবীর না-আলো আর
না-অন্ধকার।
ওদের জন্যে মাঝে মাঝে দুঃখিত হই আমি
কেননা আমার আর্তশ্বাসে
ক্রমাগতই খসে পড়ে ওদের আলিঙ্গন।

যখন শ্বাসকষ্ট চৌচির আমাকে টেনে নিয়ে যেতে চায়
দুঃসহ পতনের দিকে
মমতার চোখে ঘুরে তাকায় ওরা
কিন্তু শ্বাসকষ্টের কোনো নিশ্চিত ওষুধ
ওদের জানা নেই বলেই
আবার জুড়ে যায় পরস্পরের আগ্নেয় টানে ।
ওদের কামনাময় গোপন সিক্তশব্দ বাদ দিলে
এখন এই নক্ষত্র-মোছা নীলিমার নীচে
সমস্ত কিছুই শীতে আন্দোলনহীন ।
মাকড়শার সরু জাল
আর আমার বিনষ্ট মুখরেখার বাইরে
কোথাও জমছে না শিশিরের কাঁটা ।
প্রহরগুলোর মধ্যে নেই
মৃদুতম ঘণ্টাধ্বনি,
একরঙা দৃশ্যপটের পার্বত্য-মহিমার গায়েও
আঁটা নেই এমন কোনো ঘড়ির কাঁটা
যা বলে দেবে সময়ের সংকেত
অর্থাৎ পৃথিবীর পুনর্জাগরণের নিকটবর্তী হতে
আর কতখানি ।
মধ্যরাত্রির গূঢ় নির্দেশে
মারাত্মক কোনো গোপন সার্কাসেই হয়তো বা
একটা হলুদ পাতাও খসে পড়ছে না ভয়ে
যেন সব কিছুর হাতে-পায়ে অদৃশ্য এক শিকল ।
আবরন এবং উন্মোচনের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে

আবরণ এবং উন্মোচনের মাঝখানে
যে জ্বালাময় আঁচ এবং আগুনের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন
তার অভাবে
এই নিষ্কম্প নির্জীবতাই চরাচরের প্রিয় এখন।

অতএব
হাড়-পাঁজর বাহান্ন টুকরো হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে
খানিকটা বাধ্যবাধকতাবশতই
আমাকে তাকিয়ে থাকতে হয় ওদের দুজনের দিকে
পৃথিবীর না-আলো
আর না-অন্ধকার।
আমার শ্বাসনালী
যখন পরিশুদ্ধ বাতাসের জন্যে
হাঁ-করা হাপর,
ওদের ভালোবাসাবাসিই
তখন আমার কাছে একমাত্র সম্ভাবনাময় দৃশ্য।
বেশ বুঝতে পারি ওদের মৃদুতম উচ্চারণও
নেমে যাচ্ছে মৃত্তিকা-গর্ভের শিকড়ে
এবং বৃক্ষের অন্তর্গত
শত সহস্র ভ্রূণের আত্মনির্মাণের অস্থিরতায়।

পৃথিবীর প্রত্যেক রাত্রে
রাত্রি কীভাবে গর্ভবতী হয়
আর কীভাবে এই রক্তাক্ত ভূপৃষ্ঠে ভূমিষ্ঠ হয়
নবজাতক
অর্থাৎ ইতিহাসকে আলোকিত-করার আলো
আমার ছিন্নভিন্ন শ্বাসকষ্টের সঙ্গে মিশে যায়
তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অভিজ্ঞতা।

অত্যাচারে

তাদের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে ঝড়ের রাতের কালো ডানা।
গোটা প্রাসাদটাই ভেঙে পড়বে বুঝি এখুনি
এই আতঙ্কে যতবার শিউরোয়
তাদের বোবা-নীরবতার পাথর ফাটিয়ে
ধ্বংসের আর-এক প্রতিশব্দ,
পাতার সঙ্গে পাতার
ডালের সঙ্গে ডালের মুহুর্মুহু ঘষটানি লেগে।
সমুদ্র নেই আশপাশে কোনোখানেই
অথচ রোঁয়া ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অমঙ্গলের গর্বা
এক ঢেউ থেকে আর-এক ঢেউয়ে গড়িয়ে
ক্রমশই লম্বা করে চলেছে সর্বনাশের এলাকা।
হুকুম-তামিলের শেষ ক্ষমতাটুকু হারিয়ে
হাঁপ-ধরা হাওয়া থেকে থেকে আছড়ে পড়ছে
তাদের গায়ে, পায়ে।
গ্রীস, রোম, আর মিশরের কোনো কোনো ষড়যন্ত্রময় রাত্রির কথা
মনে পড়ে যায় তাদের।
বস্তুত কে অস্বীকার করেছে পুরোপুরি
এই রকম সব ঘোড়ার ঘাড়ের লাফিয়ে-ওঠা কেশরের মতো
এখন তাদের বুকের ভিতরের তোলপাড়।
প্রাচীন রক্তের ধারে কোষে
যদিও শত-শত শরীর ইতিহাসের নির্যাস,
তবুও এখন ভুগে রয়েছে তারা রক্তের রাতের কালো ডানার
অত্যাচারে।

ভ্রমণ কাহিনী

"Witches in Macbeth are part of the landscape." Jan Kott

এপারের জঙ্গলগন্ধ অন্ধকারে আমাদের নামিয়ে
অল্প দূরের ব্রিজে বিসর্জনের তুমুল ভাসায় এক ঝলক নেচে
রেলগাড়িটার লম্বা দৌড় ওপারের দিকচিহ্নহীনতায়।
তারপর সমস্ত শব্দের ঢলে-পড়া ঘুম।
আমরা কেউ ওভারব্রিজের খোঁজে ঘাড় ঘোরাই
কেউ আকাশে যেমন তেমন একটা চাঁদ অথবা চেনা নক্ষত্রের খোঁজে।
আকাশের যে জায়গাটায় চাঁদ থাকার কথা
নিদেনপক্ষে ছুটকো-ছাটকা ইনভার্টারে জ্বালানো লণ্ঠন
ইসকেমিয়ার ঘোলাটে চাউনীতে সব লেপাপোছা।

পাহাড়টা কোন্ দিকে? উত্তরে না দক্ষিণে?
কেউ একজন প্রশ্ন করে।
পাহাড়ের আগে শাল-মিছিলে ঘেরা হ্রদ। দক্ষিণে, না উত্তরে?
অন্য কারো জানার ইচ্ছে।
ওভার ব্রিজটা সামনে, না পিছনে?
কেউ একজন শুনিয়ে দেয় জবাব:
সব স্টেশনের ওভারব্রিজ থাকে না কিন্তু
অনেক স্টেশন কার্ড-বোর্ডে-কাটা মানুষের মতো সমতল।
কে কার সঙ্গে কথা বলছি
বুঝতে পারি শুধু কণ্ঠনালীর সৌজন্যে।
দুর্গদেয়ালের মতো অন্ধকারে আমরা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন।

আমাদের বলে দিয়েছিল স্টেশন থেকে নামলেই

লাল মাটির সোজা রাস্তা।
হয়তো আছে, কিন্তু অন্ধকারের দরজায় তো ফুটো নেই কোনোখানে।
আমাদের বলে দিয়েছিল স্টেশন থেকে নামলেই
এক দৌড়ে পৌছে দেওয়ার একা।
হয়তো ছিল, কিন্তু এখন তো মূর্চ্ছিত-চেতনার মাঝরাত।

হঠাৎ কার যেন মনে পড়ে যায় টর্চের কথা।
টর্চ, টর্চ। টর্চ জ্বালাচ্ছিস না কেন?
নেমে আসি বালি-কাঁকরের ঢালু প্রান্তরে,
পথপ্রদর্শক টর্চের আলোর প্রেতচক্ষু।

ডাইনে আলো পড়ে টর্চের। ওটা কি?
ঝাঁঝরা কঙ্কাল, কোনো এক সময়ের সাতমহল অমরাবতীর।
টর্চের আলো ঘোরে বাঁয়ে। ওটা কি?
সমুদ্র-জাহাজের ভাঙচুর কাঠকাটরা আর নষ্ট নোঙর।

পথ আর পৌছনোর মাঝখানে
কী দুঃস্বপ্ন-শাসিত ব্যবধান!
মন্ত্র আর আবৃত্তির মাঝখানে
গণনাহীন বলির রক্তরেখা।

জন্ম থেকেই তো আমরা এই রকম, ঠিকানাহীন।
কেউ একজন বাতাসে ভাসিয়ে দেয় তার দীর্ঘশ্বাস।
সমস্ত রেলগাড়িই আমাদের বেলায় ছত্রিশ ঘণ্টা লেট।
কেউ একজন বুক থেকে নিংড়ে আনে তার কুয়াশা।

হঠাৎ ঝড় উঠলে হয়তো সাড়া পাওয়া যেত লোকালয়ের,

কে যেন ঝাঁই মেরে উঠল তার বিষন্নতার বুদবুদ সরিয়ে।
রমণীসুলভ হ্রদের কোমর জড়িয়ে শালবনের মাতাল যৌবন
তাকে পেরোলেই সম্রাট মহিমার পাহাড়।
আমাদের পৌঁছনোর কথা সেইখানে।
সেইখানেই বিধ্বস্ত লাল রোদের কেন্দ্রে
আমাদের সবুজ বাংলো রক্তকরবীর বেড়া দিয়ে ঘেরা।
ছেলেবেলার পানের ডাবর থেকে লাফিয়ে-ওঠা কেয়াখয়েরের উল্লাস নিয়ে
বাতাস বুনছে বীজাণুহীন অভ্যর্থনা,
আমাদের ঠিকানাবদল সেইখানেই।

টর্চের আলো ঘোরে উত্তরে। ওটা কি?
ঝড়ে উল্‌টোনো মহান বটের মাথামুণ্ডুহীন আধখানা।
টর্চের আলো ঘোরে দক্ষিণে। ওটা কি?
ভুল স্রোতের ফাঁদে-পড়া নদীর অকাল-ধস্‌।

বিশাখার প্রশ্নে শ্রীরাধা

বিশাখা। একি! এ যে সারা গায়ে জ্বলছে উনোন!
চোখে যেন অগ্নিবৃষ্টি হয়েছে কখন, পুড়ে লাল
ঠোঁট নীল, চামড়া হলুদ
কপালে ফাটল, ভস্ম মুখে।
চাঁপাকলি আঙুলেরা কাটারি-কুড়োলে কাটা ডাল।
মেঘময় কুন্তলের দশা দেখলে হাসবে আঁস্তাকুড়
মরা কচ্ছপের মতো মাথায় উপুড় বাসি খোঁপা।
নদীতে আছাড় খেয়ে কপাল ভাঙার পরে নৌকোরা যেমন
স্রোতে আত্মসমর্পিত ভেসে থাকা ছাড়া
ভুলে যায় গন্তব্য ও গমনাগমন
সেই হাল জ্বরে-পোড়া তোর শরীরের।
ধন্যি মেয়ে, গায়ে এত জ্বর
কদমতলার জন্যে তবু চোখ উড়াল ভ্রমর।
চন্দ্রাবলী, শোন!
ভালোবাসাবাসি নিয়ে খেলা হল ঢের
ঢের বাঁশী শোনা হল, ঢের হল গাগরী ভরণ।
আমার মিনতি, যদি না চাস মরণ,
কলসী নামিয়ে রাখ, খুলে ফ্যাল পায়ের নূপুর,
নীলাম্বরী, কাঁখে চন্দ্রহার।
যমুনা আকাশ-কন্যা, জলে গাঢ়, যৌবনেও গাঢ়
যমুনা কালকেও থাকবে কেউ তাকে খাচ্ছেনাকো শুষে
কদমতলাও থাকবে, কুঞ্জছায়া, নিভাঁজ কিংখাব
এবং অগুরু গন্ধে নিকানো দখিন হাওয়া তাও পাওয়া যাবে।
তোর শ্যাম থাকবে তোরই শ্যাম।

ডাকাতের বাঁশী শুনে পুড়ে-খাক হওয়া ব্যামো ছেড়ে
আজকে নে নিথাদ বিশ্রাম।

শ্রীরাধা। শরীরের কথা রাখ,
শরীরেরই যত জ্বর-জ্বালা
নৌকাডুবি, খরা, বানে-ভাসা,
বারোমাসে বারোশো মুখোশ।
আমি কি আমার এই শরীরের হাটে-কেনা দাসী ?
শুধু তার উঠোনেই ঝাঁট-পাট দিয়ে যাব ঋতু গুনে গুনে ?
আমি যে ভূমিষ্ঠ সে কি শুধু শরীরের
সমান্তরাল হব এইটুকু মিছরী-দানা সুখে ?
শরীরেরও কতটুকু যথার্থ শরীর ?
বিশাখা ! যখন সূর্য ওঠে,
কিংবা সূর্য ডুবে যায়, যাবার আগের সন্ধিক্ষণে
রাজমহিষীর প্রাপ্য ভালোবাসা দিয়ে
রক্ত-ওষ্ঠে দিগন্ত রাঙায়
তখন কে খুশি হল বল ?
শরীরের অন্তর্গত চোখ ? না শরীর ?
নাকি ভিন্নতর কেউ
বুকের ভিতরে গুহা বানিয়ে আলোর স্তব যার ?

বিশাখা। আহা ! সে তো অন্য আলো !
আকাশের আত্মউন্মোচন।
সে আবীর যত মাখো, চোখ দিয়ে যত করো পান
অবসানহীন।
ঘরের আলোর মতো সে তো আর নিয়মের জ্বালার-নেভার
ফাই-ফরমাস খেটে গৃহস্থকে খুশি করবার

মাপা-জোপা আলো কিংবা আলো-কণা নয়।
সে এক দ্বিতীয় আলো।
দৃষ্টির সুড়ঙ্গ বেয়ে তার অভিযান
চেতনা-শিখরে।

শ্রীরাধা। বিশাখা: তাহলে তুই একটু আগে বললি কি করে
চের ভালোবাসাবাসি, ডাকাতের বাঁশী?
সাজানো-সংসার, স্বামী, সমাজ-শৃঙ্খলা
ভিজে কাপড়ের মতো খুঁটিতে ঝুলিয়ে
আমি যার কাছে যাই সেও এক দ্বিতীয় আলোই।
কতটুকু মাছ-মাংসে শরীর সন্তুষ্ট হয় জানি
শরীরের খিদে মিটলে আরো বড় খিদে জেগে ওঠে।
আমার এ জীবনের কতটুকু ছারখার পুড়বার নশ্বর কঙ্কাল
কতটুকু পৃথিবীর রোদে-জলে মেঘে-ঝড়ে চিরকাল লিখে রাখবার
স্বজন-মহলে বাধ্য বিনোদিনী হয়ে বেশি সুখ
নাকি বিদ্রোহিনী হলে সমস্ত ললাট জুড়ে আকাশের আশীর্বাদ পাবো
তারই মূল্যায়ন কিংবা সেই আত্মপরিচয় পেতে
সর্বস্বের বিনিময়ে আমি তার কাছে ছুটে যাই।

দ্বিতীয় আলোর মতো ঐ এক দ্বিতীয় পুরুষ।
তার কাছে পৌঁছলেই পেয়ে যাই নিজের শিকড়,
সংসারের কাটা-ছেঁড়া, প্রত্যহের ছোট ছোট মরা
নিমেষে সেলাই এক জরির সুতোয়,
অস্তিত্বে অস্ফুট পদ্মে শত পুষ্প গেয়ে ওঠে গান।
জাগে জন্মান্তর, জাগে নতুন জন্মের নৃত্যতাল
যেন আমাকেই ঘিরে চতুর্দিকে শঙ্খের উৎসব।
অভিষ্ট রয়েছে যার, তার হাঁটা অগ্নি ছুঁয়ে ছুঁয়ে
রক্ত-রেখা পথে, শুধু তাকেই মানায় প্রতিশ্রুত
ঝড়ের রাতের অভিসার।

গোলাপ সুন্দরী পড়ে

তোমাদের মনে হতে পারে ছেলেখেলা, ইয়াকি-ফাজলেমির নশ্বরতাও হয়তো বা,
কিন্তু এই বুদবুদগুলো প্রকৃতপক্ষে আমার নিজস্ব অহঙ্কার !
হাওয়া, যে-কোনো ওড়াউড়িময় সৃষ্টির সম্পর্কে নিরুত্তাপতার জন্যে যে বিখ্যাত,
সরাসরি তার সঙ্গে এক গোপন পাঞ্জার লড়াইও বলতে পারো এটাকে ।
সেই কারণেই আমার হাতের এনামেলের বাটিতে সাবান জল
আর এখন আমি এই পাহাড়-সদৃশ হাসপাতালের খৃষ্টপূর্ব প্রাচীনতার সামনে
যার খোপে খোপে মৃত্যুর শৈশব দিকে
শৈশবের মৃত্যুর দিকে যবনিকাহীন যাতায়াত ।
এই বুদবুদগুলো শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌছবে আমার জানা নেই
কিন্তু এদের উদ্দেশ্য এবং উপকারিতা সম্বন্ধে আমি শতকরা নিরানব্বই ভাগ সজাগ ।
এই রঙীন অহঙ্কারময় খেলাটি আমি আশ্চর্যভাবে শিখেছি বাল্যকালে
বাল্যকালের পক্ষে যে-সব গল্প প্রবন্ধ-কবিতা-উপন্যাস-ছবি এবং গান অশ্রদ্ধামূলক
তার প্রত্যেকটির মধ্যেই আমি দেখতে পাই এই সাবান জল
আর সাবান জলের উপরে ঝুঁকে পড়া সেই সব মানুষদের
যাদের ক্ষতবিক্ষত মুখের ভাস্কর্য রেখার উপরে সমকালীন নয়,
ভবিষ্যৎ শতাব্দীর সূর্যরশ্মি অভ্যর্থনার আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত ।
বস্তুত এই সাবান জল আমি পেয়ে গেছি একপ্রকার উত্তরাধিকারসূত্রেই
এখনকার এই বুদবুদগুলোই শুধু আমার ।
ভ্রাম্যমান অক্ষর !
যাও, আকাশে একটা নতুন এলাচ-গন্ধের দ্বীপ গড়ে এসো ।
ভ্রাম্যমান অক্ষর !
ঐ নিশ্বাসহীন যুবকটিকে বলে এসো আকাঙ্খারই অন্য নাম জীবন ।
ভ্রাম্যমান অক্ষর !
অসহ্য রক্ত-প্রবাহের পিছনে যে বিশ্বঘাতক অস্ত্র
তাকে জানিয়ে দাও একদিন এর প্রতিশোধ নেবে যুদ্ধের চেয়েও ভয়ঙ্কর সব গোলাপ ।"
সারাবেলা এই আমার অস্তিত্বের সবচেয়ে প্রিয় খেলা ।

নচিকেতা ! কি চাই তোমার ?

আগ্নেয়গিরির কাছে হাত পেতে আছে একজন
নির্ঝরেরও কাছে :
প্রার্থনায় নুয়ে আছে বহু-বর্ণ মেঘের সম্মুখে।

যুদ্ধে রাজী নয় তবু রাজত্ব ও রাজকন্যা সকলেই চায়।
রক্তাক্ত পেশীর ঘাম ছাড়া চায় পর্যাপ্ত ফসল।
দরোজা-জানলা নেই শুধু কিছু চেয়ার-টেবিল
তৎসহ টাইপিস্ট পেয়ে অনেকেই গিলে খেয়ে ফেলে
যৌবনের ডায়েরীর অগ্নিরেখাগুলি।
স্বপ্নের লাটাই থেকে তার ঘুড়ি একদিন উড়ে উড়ে ছুঁয়ে ফেলেছিলো
পাহাড়ের সোনার মুকুট
সে উজ্জ্বল স্মৃতিকেও হাওয়ায় ভাসায়।

নিখিল-নক্ষত্র থেকে মানুষের এইভাবে সরে সরে আসা
এই ভাবে নীলিমার প্রতিচ্ছবিহীন ঘোলা জলে
মানুষের স্নান
ঠিকুজী-কোষ্ঠীর কাছে হাঁটুমুড়ে অনুসন্ধান
ফোকোটের গুপ্তধনে পেয়ে যাবো ক' হাঁড়ি মোহর ?

আগ্নেয়গিরির কাছে হাত পেতে আছে একজন
নির্ঝরের কাছে।
প্রার্থনায় নুয়ে আছে বহুবর্ণ মেঘের সম্মুখে।

নচিকেতা ! কি চাই তোমার ?
আমার বিদীর্ণ শাঁখ যেন পায় সমুদ্রের উত্তরাধিকার।

এই পৃথিবীতে আরো বহুদিন চিরদিন

এই পৃথিবীর কিছু গাছ আছে স্বাধীন প্রান্তরে
কিছু গাছ করাতের দাঁতে।
করাতের দাঁতে যারা, তারা কেউ বন্য গুল্ম, অপ্রাপ্তবয়স্ক ক্রম নয়
অবিকল আস্ত গাছ
শুধু ছাঁটা হয়ে গেছে অস্থি-গ্রন্থী-বাহুমূল ক্রমবিকাশের।
অবিকল আস্ত গাছ
শুধু কাটা হয়ে গেছে অন্বেষক আমূল শিকড়।
তবু দেখে বোঝা যায়
যথার্থই শ্রীমণ্ডিত গাছ ছিল এরা একদিন
এদের মৌল কোষে আকাঙ্ক্ষার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ছিল।
যার যতটুকু সাধ্য রক্তজাত ফল, ফুল, চিকন পল্লব, গন্ধ, বীজ
কৃতজ্ঞ মাটির হাতে তুলে দেবে বিনীত শ্রদ্ধায়
সে-রকম উদ্ভাসিত সদিচ্ছাও আঁকা ছিল ললাটদীপ্তিতে।

যতক্ষণ করাতের থেকে দূরে স্বাধীন প্রান্তরে
গাছ থাকে স্বপ্নে মহীয়ান,
মানবিক, মানুষের প্রতিনিধি হতে চাওয়া প্রতীক-প্রতিম,
সৃষ্টি-সুখে উথাল-পাথাল
চিরস্মরণীয়তার মুকুটই একমাত্র তার উপার্জনের।
প্রজ্ঞাকে যা জলদান করে
শুধু সেইটুকু ছাড়া আর সব বাতিল কাগজ।

স্বাধীন প্রান্তর ছেড়ে করাতের দাঁতে চলে এলে
এই সব গাছেদেরই টিউবলাইট বেশি ভালো লেগে যায়
জ্যোতিষ্কে সাজানো সৌরমণ্ডলের চেয়ে।

ভিন্ন করে দিতে-চাওয়া ভিন্ন হাওয়া এসে
এই সব গাছদেরই ডেকে নিয়ে যাব দূর-খানে
অন্য কোথা অন্য কোনখানে।
আর তরবারি নেই, শুধু থাপ, থাপের গৌরব
আর মগ উচ্চারিত দেওয়ালির বাক্যের উৎসব।
শুশ্রূষার ঝর্ণা নেই, রুপোর রূপের মতো বালি চোরাবালি,
এবং পাথর যারা অতি কারুকার্যময় মিশরের মমির মতন,
যেন দিগ্বিজয়ে যাবে এইভাবে দিগন্তের দশদিক জোড়া বিজ্ঞাপন,
স্বরচিত সংবিধান, শাসন-প্রণালী।
আর ভালো লাগেনাকো চিন্তার তন্বিষ্ঠ শ্রমে
স্বোপার্জিত চির-সিংহাসন
ভালো লাগে দুদণ্ডের ইলশেগুড়ির করতালি।
প্রজ্ঞাকে যা জলদানে সাজায় বর্ণালী
শুধু সেইটুকু ছাড়া আর সব কিছুকেই উষ্ণ আলিঙ্গন।

এই পৃথিবীতে আরো বহুদিন চিরদিন বহু গাছ রয়ে যাবে
স্বাধীন প্রান্তরে,
কিছু গাছ করাতের দাঁতে।

গভীর খনন আর খুঁড়ে খুঁড়ে পৃথিবীর
ভিতরের সার,
দু-দশ হাজার কিংবা আরো বহু শতাব্দীরও
বহু আগেকার
শিলালিপি, ভাঙা হাঁড়ি, টুকরো স্বর্ণ, ঘন আকাঙ্ক্ষার
ছাই-ভস্ম ছারখার
একে একে আবিষ্কার হয়ে যায় যেন।

অকস্মাৎ আলো-নিভে যাওয়া হাওয়ার
পেট কেটে যদি আলো জ্বলে ওঠে হঠাৎ আবার
লণ্ড ভণ্ড সময়ের দিক নির্ণয়ের আলো হয়ে,
সে-রকমই স্বাস্থ্যকর মনে হয় এই সব অক্ষরমালার
গভীরের বীজ, ধ্বনি, লতাগুল্ম, স্রোতও
সাঁতার।

আমাদের যাওয়া

এই তছনছ
এই কানা খোঁড়া সময়কে চিরে
আমাদের যাওয়া।

হয়তো এমনও হতে পারে
নিজের ছায়াই সাত টুকরো হয়ে সাতটি লুম্পেন
ভোজালি ঠেকিয়ে বলবে,
"টুঁ শব্দ কোরোনা।"

হয়তো এমনও হতে পারে
আমাদের আকাঙ্খার হোমটুকু,
যজ্ঞ বেদীটুকু,
অর্থাৎ নির্মাণ কাজে আগুনের ব্যবহারটুকু,
দুর্বিপাকে দিকনির্ণয়ের
কম্পাস সদৃশ বোধ বিবেচনাটুকু,
কারো পক্ষে ততখানি সুখপ্রদ নয়
ঘুমের ব্যাঘাতও কারো
কিংবা কারো গলার পাথর।

এই তছনছ
এই হাবাগোবা সময়কে চিরে
আমাদের যাওয়া

নদীটি বাঁকের মুখে শুয়ে

নদীকে বাঁকের মুখে ফেলে
দৌড়ে পালালো কটি ছেলে
লাল-কালো আগুনের দিকে
রক্তের ছুরিখানা পোড়ে
প্রশ্নকাতর মোড়ে মোড়ে
দূরের দামামা ক্রমে ফিকে ।

নদীটির কাছে যাই যত
শতাধিক বছরের ক্ষত
স্মৃতি হারানোর মতো চুপ
কেবল চোখের মনি দুটো
যদি ও জড়ানো খড়-কুটো
জ্বেলে আছে উল্কার রূপ ।

নদীটি বাঁকের মুখে শুয়ে
নদীটি খরার বালি ছুঁয়ে
নিজের ঠিকানা-হারা নদী
আমরা কি কেউ আছি জেগে ?
নদীটি আগুন তাপে রেগে
হঠাৎ প্রলয়ে মাতে যদি ?

দৈবক্রমেই তোমার সঙ্গে দেখা

দৈবক্রমেই তোমার সঙ্গে দেখা
তখন তুমি সাঁকোর পরে একা
মড়মড়িয়ে ভাঙছে তখন সাঁকো,
সাঁকোর নীচে খরস্রোতা বান
বাঁধ ভেঙেছে নগর ছত্রখান
চেঁচিয়ে বলি, বাঁচতে হলে বাঁকো।

তখন তুমি নিজের দিকে ঝুঁকে
গোপন কিছু লুকিয়ে নিলে বুকে
শুধিয়েছিলে, তুমি কোথায় থাকো?

আমি থাকি বজ্রে, বন্যা-জলে
যেসব ব্যথা অন্ধকারে জ্বলে,
বাঁচতে হলে আমার সঙ্গে বাঁকো।

দৈবক্রমেই তোমার সঙ্গে দেখা
তুমি তখন মৃত্যুকালীন একা।

বেটেছি চন্দন

তোমার জন্যে বেটেছি চন্দন
মঞ্চে আলো জ্বালা
অভ্রভেদী পাহাড় থেকে এনেছি পেড়ে ফুল
ভুবনজোড়া থালা।

কী সংগোপন ছিল তোমার ঘর
পাথর দিয়ে ঢাকা
এখন দেখি দেয়ালে তার ব্রতের আলপনা
রক্তচিহ্নে আঁকা।

মানুষ এবং সময় এবং শীত
শীতের জন্যে তুলো
বাছতে গেছো, ভ্রুকুটিময় হাওয়ারা ছুঁড়ে গেছে
অবাঞ্ছিত ধুলো।

মেঘের পরে জমেছে ঘন মেঘ
দুঃখে কাঁপে বন
অভ্রভেদী পাহাড় থেকে এনেছি পেড়ে ফুল
বেটেছি চন্দন।

তোমাকে বন্দনা করা অসম্ভব

তোমাকে বন্দনা করা অসম্ভব হলো আজ বারোই আশ্বিনে।

একুশে বৈশাখে
আমার গাছের ছায়া বাঁকিয়ে দিয়েছ ভিন্নমুখে।
সাতই জৈষ্ঠ্যের মধ্যরাতে
আমার জোৎস্নাকে চিরে ফালি ফালি করেছিলে উদ্দেশ্যবিহীন।
উনিশে আষাঢ়ে
মুথো ঘাস রুয়েছ বাগানে।

সম্ভবত সকলেই ভুলে যেতে চায় তার নির্মাণের আদি কাঠ খড়।
জুলায়ে অগাস্টে সেপ্টেম্বরে
যে বছর চলে গেল তার বহু আগেরও বছরে
বালতি ডুবিয়ে জল নিয়ে গেছে আমারই কূপের।
অভ্রখনি খুঁড়ে খুঁড়ে অতীতের শতাব্দীর কণ্ঠহার মিথুন ভঙ্গীর
কঙ্কণ ও কর্ণোৎপল কে এনে দিয়েছে?
যতদিন সুখী ছিলে, স্বেচ্ছাচারী ছিলে।

তেসরা শ্রাবণে
যৌথ সিন্দুকের চাবি ছিনিয়ে নিয়েছ।
পয়লা ভাদ্রের ঘন বৃষ্টির ভিতরে
অ্যালবামের ছবি থেকে লুটেপুটে নিয়েছ রোদ্দুর।
বারোই আশ্বিনে
তোমাকে বন্দনা করা অসম্ভব কষ্টসাধ্য হলো।

অথচ তোমার মুখে আলো

সময়ের ছারখার, অথচ তোমার মুখে আলো।

কালকেউটে এখুনি কামড়ালো
কাকে যেন, কাকে?
এবারও কি লখিন্দর পাবে বেহুলাকে?

ও বৌ ক্রমশ নীল, আরো নীল, রক্তে হিমকণা
ও বৌ আমাকে ছেঁড়ে আগুনের কুড়ি লক্ষ ফণা
ও বৌ আমার হাড়ে বিঁধে যায় কার তুরপুন?
স্মৃতি ঘুম, ঘুমই স্মৃতি
চেতনাসাম্রাজ্যে ঘন ঘুম।

ও বৌ এ কার চোখ সব দৃশ্যে সাদা অন্ধকার
নীলের সবুজ ছিল, সবুজের লাল অহঙ্কার
প্রকৃতি, প্রকৃত খেলা, এক বর্ণে বহুর বিন্যাস।
জীবন, জীবন মৃত্যু, জয়-পরাজয় নৃত্য, কথাকলি, রাস
তা তা থৈ থৈ
অস্তিত্ব উন্মুখ, তবু সে বৃহৎ ভূকম্পন কই?

ও বৌ এ কার স্পর্শ, ভস্ম যেন, কার ভস্মাধার?
এখন খাণ্ডব মানে দাহ শুধু, পুড়ে কাঠ-হাওয়া?
খাণ্ডব অরণ্য নয় আর?

ও বৌ ক্রমশ নীল, আরো নীল, দীনতার নীল
বিশুদ্ধতা ভেঙে যায়, নতোমুখ নিজস্ব নিখিল
নীল, নীল

নীল।

সময়ের ছারখার, অথচ তোমার মুখে আলো।
কালকেউটে এখুনি কামড়ালো
কাকে যেন, কাকে ?
যেখানেই আত্মদীন নীল লখিন্দর
বেহুলা কি সেখানেই থাকে ?

তোমাকে অধিক ভালোবেসে

তোমাকে অধিক ভালোবেসে
মোমবাতি জ্বলে গলে যায়।

এত জ্বলে, এত আত্মক্ষয়ে
কী যে পায়
কী করে যে হাসে
কী হওয়া সে হয়, কেউ জানে ?

মেঘেরও নিজেকে ঢেলে সুখ।
যেমন জলের সুখ
মাটিকে গর্বিত গর্ভদান।

লুণ্ঠনের ষড়যন্ত্রে
চোখ দুটি বড়ই চতুর।
অপহরণের যোগ্য যেখানে যা কিছু
সব তার স্পর্শে ঘ্রাণে
অস্তিত্ব-নির্মাণে পাওয়া চাই।
অথচ পাওয়ার মানে
জিজ্ঞাসার সংখ্যাকে বাড়ানো।
পরিণত হওয়া আর কাকে বলে
দীর্ণ হওয়া ছাড়া ?

তোমাকে অধিক ভালোবেসে
মোমবাতি নিজেকে পুড়িয়ে
কী করে ঐশ্বর্যবান রয়ে যায় তবু
নিজে জানে, আর কেউ জানে ?

যতক্ষণ স্বেচ্ছানির্বাসনে

নরম ক্লোভের নীল পাখিগুলি রয়েছে ভিতরে।

জানি বহু মূল্যবান তোমার চাদর
অতীতের শতাব্দীর কাছ থেকে কিনেছো নীলামে
কিছু ফুটোফাটা, কিছু পান-কষ, কিছু ছেঁড়া জরি
কলকায় ফাটল
তবু তার স্মরণীয়তার বন্দনায় মুখরিত এখনো বাতাস।

ঘরের বাহির থেকে কেউ যায় ভিতরের
মেহগনি খাটে,
ঘরের ভিতর থেকে কেউ হেঁটে চলে যায় উদাসীন
স্বেচ্ছানির্বাসনে।

তোমার চাদরে তুমি থাকো।

আমি ও আমার পাখিগুলি
নরম ক্লোভের নীল পাথরের সবুজ ব্যথার
কাছাকাছি থাকি।

ঘরের ভিতরে গেলে তোমার মুখের চেয়ে
ঢের বেশি মূল্যবান মনে হয় তোমার চাদর।
যতক্ষণ স্বেচ্ছানির্বাসনে
আমার কালি ও তুলি
তোমাকে মরণ থেকে ছিঁড়ে এনে দিতে পারে
আলাদা মুহূর্ত।

বুকের ঝারিতে তার

বুকের ঝারিতে তার বৃষ্টি ছিল
সদিচ্ছা ছিল না,
আমাকে সে উদ্ভিদের স্বতঃস্ফূর্ত
উল্লাস দিল না।
দেয়াল পুরনো হলে কিছু ভাঙে কিছু রয়ে যায়
ইঁটের কঙ্কাল থেকে মৃত স্মৃতি মাটিতে ছড়ায়।
যত পুরাতন হলে স্বপ্নের পেশীতে ধরে ঘুন
তত দীর্ণ নই রক্তে বিকেলের গোলাপী আগুন
এখনো কত্থক নাচে, দীর্ঘকায় স্থাপত্যের কাছে গিয়ে বলি
স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা চাই, চাই না সোনার নীল থলি।
বুকের ঝারিতে তার পথ্য ছিল
আতিথ্য ছিল না,
আমাকে মুহূর্ত দিল, নবজন্ম
এখনো দিল না

অপরাধপ্রবণতা আছে বলে

অপরাধপ্রবণতা ছিল বলে তোমাকে পেয়েছি ;
অপরাধপ্রবণতা ছিল বলে তুমিও আমাকে
তোমার ছুরির ফালে পেয়ে গেছো রক্তমাংসময় ।

গতকাল, কতকাল পরে
মুখোমুখি, তবুও তোমার
মুখ দেখা বাকি রয়ে গেল ।
আঙুলে আগুন মেতেছিল
বাতাসে বাগান কেঁপেছিল
মৃদঙ্গের শব্দে বেজে উঠেছিল ভূমিকম্পনের
পাপ-পুণ্যহীন ভাঙচুর ।
কে বলেছে তুমি খুব দূর ?
অপরাধপ্রবণতা তোমাকে আমাকে
এখনও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে
সুচিন্তিত ভুলে
রাত্রির গভীর গর্ভমূলে ।
এখনও আমার
বিদ্যুৎচুল্লীর চেয়ে তোমাকেই বেশি দরকার ।
অপরাধপ্রবণতা এখনও রয়েছে মর্মতলে,
ক্ষুধার্ত ডুমুরগুচ্ছ হয়ে গাছে ফলে ।
অপরাধপ্রবণতা আছে বলে তুমিও এখনো
সূর্যমন্দিরের মতো আমার ভুবন ছুঁয়ে আছো ;

কবির চোখের কাছে

কবির চোখের খুব কাছে যেওনাকো
পুড়ে যেতে পারো।

আমরা যেভাবে রোজ জামা ছাড়ি, চুল আঁচড়াই
সেইভাবে নবীনতা সৃজনশীলতা ভালোবেসে
ঈশ্বরের পৃথিবীর পুরনো আলোকসজ্জা ভেঙে
সূর্যকে নতুন পথ
শঙ্খকে নতুন কণ্ঠস্বর
দিতে চেয়ে কবি তার নিজের হৃৎপিণ্ড তুলে দেয়
বিরুদ্ধ আগুনে।

কবির চোখের খুব কাছে এসোনাকো
তুমিও নতুন হয়ে যেতে পারো
ধ্বংসের শিখায়।

কলকাতা

কলকাতা বড় কিউবিক।
যেন পিকাশোর ইজেলে-তুলিতে
গর-গরে রাগে ভাঙা।
কলকাতা স্যুররিয়ালিস্ট।
যেন শ্যাগালের নীলের লালের
গূঢ় রহস্যে রাঙা।।
কলকাতা বড় অস্থির।
যেন বেঠোফেন ঝড়ে খুঁজছেন
সিমফনি কোনো শান্তির।
কলকাতা এক স্কাল্পচার।
র‍্যাঁদার বাটালি পাথরে কাটছে
পেশল-প্রাণের কান্তি।।

আমাদের বাড়ি-ঘর

আমাদের বাড়ি ছিল মধু রায় লেনে
মধু রায় লেনে ছিল পজলের মতো বাঁকা সিঁড়ি
সেই সিঁড়ি নিয়ে যেতো আকাশের নাগর দোলায়।
মধু রায় লেনে আর আমাদের বাড়ি-ঘর নেই।

আমাদের বাড়ি ছিল আহিরীটোলায়
আহিরীটোলায় ছিল পাখিদের লেবুর বাগান
লেবুর বাগানে ছিল যা খুশি লেখার ছাপাখানা।
আহিরীটোলায় আর আমাদের ছাপাখানা নেই।

আমাদের বাড়ি ছিল শ্রীমানি মার্কেটে
শ্রীমানি মার্কেটে ছিল অনির্বাণ দুঃখের উনোন
উনোনের হাতে ছিল প্রতিভার লাল নীল তুলি।
শ্রীমানি মার্কেটে আর আমাদের সে উনোন নেই।

আমরা এখন আছি কংক্রীটের সর্বোত্তম ফ্ল্যাটে
কংক্রীটের ফ্ল্যাট থেকে আরও বহু কংক্রীটের ফ্ল্যাট দেখা যায়
ওয়ার্ডরোব দেখা যায়, বাথটাব, টিভি দেখা যায়।
কংক্রীটের ফ্ল্যাটে আর আমাদের পাখি-বয়সের
লেবুর বাগান নেই
লেবুর বাগানে নীল ছাপাখানা নেই
উনোনের ধারে বসে আগুনের স্বরলিপি নেই।

প্রশ্ন

কতটা গভীর হলে
নিরন্তর বেগবান নদী হওয়া যায়
তুমি তার মাপ জানো নাকি ?
মহান বৃক্ষের কাছে
একটি মানুষ এসে
একদিন প্রশ্ন করেছিল।

কতটা আগুন লাগে
নিখিল-দহনে পুড়ে
পরিশুদ্ধ মানুষের অবয়ব পেতে
তুমি তার পরিমান জানো ?
মানুষের কাছে এসে
এই প্রশ্ন করেছিল
কোনো এক ক্ষুধিত পাহাড়।

নন্দিনীর কিছু কথা

নন্দিনীর সব কথা
তোমাদের এখনো বলিনি।
নন্দিনীর সব কথা
তোমাদের জানা ভালো কিনা
তাও জানা নেই ।

ডুমুরের ডাল থেকে খসে পড়া তিতিরের
পালকের রেশমের নরম ব্যথায়
কিছু কথা লেখা আছে জানি ।
কিছু কথা বোনা হয়ে আছে
দুঃখিত বালির বুকে
শ্রাবণ-হারানো গাছে গাছে ।

কোনো কোনো করুণ সন্ধ্যায়
আলো খুঁজে খুঁজে খুঁজে
উপোসী হাওয়ারা ঘোরে
সমুদ্রের অন্ধকারে ডুবে-যাওয়া ঝাউবীথিকায় ।
নন্দিনীর কিছু কথা
সেইখানে পেয়ে যেতে পারো ।

নন্দিনী-শুভঙ্করের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র

(নন্দিনীর চিঠি, শুভঙ্করকে)

অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলে, সেটা রাখতে হয়।
সভ্যতা তাই বলে
আর সেটাই সভ্যতা।
তুমি খুব ভালো করেই জানো
বাড়ি থেকে বেরোতে সাতচল্লিশ রকমের ছলচাতুরী
গণ্ডা গণ্ডা মিথ্যের মুখে সত্যির স্নো-পাউডার।
হাজার উটকো বিপদের ভাবনায়
হাত-পা ডিপ-ফ্রীজের মাংস।
কাল ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় রেষ্টুরেণ্টে।
মশায়ের টিকির গন্ধ না পেয়েও
কেবিনের অন্ধকারে ঢুকে আলো জ্বালি।
টেবিলে অ্যাসট্রের মৃদু টোকায় ছুটে এসে
চেনা বেয়ারাও আমাকে দেখে এক পলকের পাথর।
তোমাকে সারপ্রাইজ দেবো বলে
পরে এসেছিলাম মায়ের বেনারসি।
গড়িয়াহাটার মোড়ে বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে,
সামনে এসে দাঁড়ালো এক ফুলওয়ালা
চণ্ডালিকার কাছে তৃষ্ণাকাতর বৌদ্ধ ভিক্ষুর ভঙ্গী।
কিনলাম একটা জুঁই ফুলের গোড়ে।
বেলকে বাতিল করে জুঁই
সেও তোমার কথা ভেবে।

তোমার পাঠানো শেষ কবিতায়
জুঁই-এর গন্ধ ছড়ানো ছিল উপমায়।

যখন সেকেণ্ডকে মনে হয় যুগ
তখন আধঘন্টা ইটারনিটি।
আর কেবিনের মধ্যে আধঘণ্টা একটা একলা মেয়ে মানে
আড়াই লক্ষ লোকের চোখের চাটনী।
ঘড়ির কাঁটা আধঘন্টা পেরোতেই মাথার শিরা ছিঁড়ে
যুদ্ধের সাইরেন,
স্বপ্নের চতুর্দিক তখন ঘিরে ফেলেছে মারণাস্ত্র।

সেদিন আমার না-ঘুমোনো রাতের চোখের জলের খবর
জানে কেবল মরা আকাশের একটা জ্যান্ত নক্ষত্র
আর মাথার বালিশ।

(শুভঙ্করের চিঠি, নন্দিনীকে)
তোমার চিঠি পেলাম আজ।
পোষ্টাপিসের দয়ায় পাক্কা সাতদিন পরে।
অ্যাপয়েন্টমেন্টের দিন
তুমি যখন আয়নার সামনে
মায়ের বেনারসীতে নিজেকে সাজাচ্ছো
শত-জাহাজ-ডুবোনো হেলেন,
আমার তখন একশ এক।
তুমি যখন মাথা-মুণ্ডু চিবোচ্ছো আমার রেষ্টুরেণ্টে
আমার তখন একশ দুই।
৬/৭/৭৬ থেকে পুরোপুরি বিছানাবন্দী।
গনগনে চুল্লি সেঁকে চলেছে

ব্রেকফাস্টের পাউরুটি।

অথচ কি আশ্চর্য
তুমুল জ্বরে অচৈতন্য যখন
এলিয়টের সেই বিখ্যাত ইভনিং-এর মতো
যখন বিছানায় ইথারাইজড,
এক এক করে সাতচল্লিশটা কোলাপসিবল ভেঙে
তুমি, জীবপালিনী,
আমার আগুনের শস্যক্ষেত্রে ছুটে এসেছো
গোপন ফোয়ারার উৎক্ষিপ্ত জলরাশি।

মহাজাগতিক শূন্যতার ভিতরে
ভারহীন নিরবচ্ছিন্ন ওড়াউড়ি আমাদের।
সিসটাইন চ্যাপেলের দেবদূত
অথবা নিউজ উইকের রূপবান রঙীন রকেটের মতো
আমাদের আকাশ মন্থন-করা তিমিরাভিসার।
পৃথিবীর প্রথম দুটি নর-নারীর নিবাস নগ্নতায়
আমাদের ত্বকে ব্রেকের ছবির সোনালী আভার পালিশ।

অনন্তের ভিতরে কী অদ্ভুত বদলে গিয়েছিলে তুমি
কোটী কোটী নক্ষত্রের মোজেইকে
দপ্ দপ্ করছিল তোমার বাইজেনটাইন রূপ।
পৃথিবী নয়, এই জ্যোতি-সমুদ্রের
দরজা দেয়ালহীন ভাসমান বায়ুস্তরই
যেন তোমার আসল বাসরঘর।

অথচ এই তোমাকেই

কলকাতার ইঁট-কাঠে পাই যখন
শরীরের এপাশ-ওপাশে অষ্টপ্রহরের একশো-চুয়াল্লিশ,
সন্ধ্যে হলেই মিলিটারী-হাঁকানো কারফিউ।
ভুঁদে রাজ্যপালের গর্বিত গ্রীবায়
ন্যায়সঙ্গত তৃষ্ণাকেও ভেঙে তছনছ করে দিতে পারো
সংবিধানের শাঁখের করাতে।

জ্বরের ভিতরে কী লাজ-লজ্জাহীন ছিল তোমার সমর্পণ
যখন বললাম, নন্দিনী,
শীত আমাকে চিরে চলেছে কসায়ের ছুরিতে,
নিজেকে নিমেষে বিছিয়ে দিলে আমার উপর
মোলায়েম বুটিদার চাদর।

পুনশ্চ

জ্বর নেমেছে।
এখন বুক জ্বলছে ঈর্ষায়।
হায়, মায়ের বেনারসী
আর বৌদ্ধ-ভিক্ষুর জুঁই ফুলের গোড়েম
তোমার রাজেন্দ্রনন্দিনী রূপের
প্রথম মুগ্ধ দ্রষ্টা হল এমন একজন
বেশী চিনিতে আমাদের চা-কফিকে বিষিয়ে দেওয়াই
যার নিত্যকার কর্মকুশলতা।

নন্দিনী শুভংকরের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র

নন্দিনীর চিঠি, শুভংকরকে

রেকর্ডপ্লেয়ারে
এখন গান গাইছেন শুভলক্ষ্মী।
আমি চিঠি লিখছি পড়ার টেবিলে
আর চিঠির অক্ষরে অক্ষরে ঢুকে পড়ছে
কখনো জানা ছিল না এমন অশ্রু-সুখ।
যেখান থেকেই উথলে উঠুক
বেদনা কত সহজে আপন হয়ে ওঠে আমাদের।
পৃথিবীতে সন্দেহাতীত শুধু সেইই
আর সব কিছুতেই আমাদের অবিশ্বাস,
এমন কি আমার এই চিঠি, রক্ত পালকের পাখি,
তোমার কাছে ঠিক সময়ে পৌঁছবে কিনা, তাতেও।

শুভংকরের চিঠি, নন্দিনীকে

বেগম আখতার শুনলে
কি রকম মেঘ জমে
বৃষ্টি নামে মনের মাটিতে
তার উপমার খোঁজে স্মৃতির সুটকেশ ঘাঁটতে গিয়ে
হাতে এল নীল ফটোগ্রাফ।
পাহাড় ও সমুদ্রের চুম্বনের মাঝখানে
তুমি।
আমার ইচ্ছের নৌকো সারাদিন দাঁড় টেনে টেনে
যত যায়, পৌঁছাতে পারে না।
বকুল-ঝরানো হাওয়া
দুঃখে-কষ্টে প্রাজ্ঞ হতে থাকে।

আত্মচরিত

এক একদিন ঘুম ভাঙার পর
মাথায় বেঠোফেনের অগ্নিজটাময় চুল।
আর মুখের দুপাশে মায়াকভস্কির হাঁড়িকাঠের মতো চোয়াল।
এক একদিন ঘাড়ের উপর আচমকা লাফিয়ে
কুরে কুরে খায় কান্না, দীর্ঘশ্বাসে দীর্ঘশ্বাসে
যেন ইভান দি টেরিবলের দুমড়োনো চেরকাশভ।

ভাগ্যরেখাহীন রাজপথের আলকাতরায় উপুড় হয়ে আছে
আগামীকালের শোক-তাপ, আর সেই সব চিৎকার
রক্তপাতের রাতের গোলাপ হওয়ার জন্যে যারা উন্মুখ।
ঐ রাজপথের দুপাশে দিনে দশবার হাঁটতে হাঁটতে
যখন মাংসের কিমার মতো থেঁতো,
হঠাৎ নিজেকে মনে হয় ম্যাকস্ ভন সিদো
বার্গম্যানের সেভেন্থ সীল-এর সেই মৃত্যুজেদী নায়ক
যার লম্বা মুখের বিষন্নতায় পৃথিবীর দগদগে মানচিত্র।

এক একদিন ঘুম ভাঙার পর
চোখের ভিতরে বোদলেয়ারের প্রতিহিংসাপরায়ণ চোখ,
মনের ভিতরে জীবনানন্দের প্রেমিক চিরপুরুষের মন;
আর হাসির ভিতরে রেমব্রান্টের হিসেব-না মেলানো হাসির চুরমার।

একটি হত্যার শব্দে

একটি হত্যার শব্দে
মৃত্যু হল সমস্ত ঘুমের
ভয়ঙ্কর প্রশ্ন চিহ্নে
আমাদের উঠোনের, বাগানের, দিগন্তরেখার
মাটির মুখের রঙ কালো হয়ে গেল।

কে ওখানে স্বেচ্ছাচারে ভালোবাসা পোড়াও আগুনে ?
কী করে নিশ্চিত হলে আরো কোনো বড় আগুনের
খাণ্ডবের বীজ কেউ বুনছে না সুড়ঙ্গের লুকোনো বারুদে,
যে-আগুনে চিতাভস্ম হতে পারে তোমারও কৈলাস ?

কে ওখানে আগলাও নিজের ভাগের ভিটেমাটি ?
কী করে নিশ্চিত হলে শতস্বার্থে ছিন্নভিন্ন মেঘ
কালবৈশাখীর খড়্গে ভাঙে যদি সিংহদ্বার, স্তম্ভ ও তোরণ
তখনও তোমার ধ্বজা বাতাসের অনুগ্রহ পাবে ?

একটি হত্যার শব্দে
মৃত্যু হল সমস্ত ঘুমের।
ইতিহাসহারা কোনো গুহার ছবির মতো নৈকে-চুরে গেল
প্রত্যেকের মুখস্থের চেনা ধ্রুবতারা।